নৃবিজ্ঞান পত্রিকা-সংখ্যা ১০ পৃঃ ৭৩-১০৮
©২০০৫ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা :

এথনোগ্রাফি, জ্ঞান উৎপাদন ও পরিবেশনের সংকট: ইতিহাস সচেতন নৃবিজ্ঞানের আত্ম-অনুসন্ধান

আদিল হাসান চৌধুরী *
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন†

প্রাক-কথন

কিছু সাধারণ অনুমিতি এবং সাধারণ একটি এজেন্ডা নিয়ে এ লেখার সূচনা। বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান বিষয়ে এ অনুমান ও এজেন্ডা। নৃবিজ্ঞান চর্চা এদেশে ইতোমধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সময়কাল পার হয়ে এসেছে। অন্তত বয়সের বিবেচনায় এটি এখন অনেক পরিণত। নিজের দিকে ফিরে তাকানো এবং প্রায় দুই দশকের অর্জন ও সীমাবদ্ধতাগুলো বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। বিশ্লেষণ একভাবে শুরু হয়েছে এবং তার মধ্যে একটা প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রধান প্রবণতার তুলনায় খানিকটা ভিন্ন জায়গা থেকে শাত্র হিসেবে এ দেশে নৃবিজ্ঞানের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতাকে বোঝার চেষ্টা করাটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়েছে। এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নৃবিজ্ঞান চর্চায় এবং সংশ্লিষ্ট লেখালেখিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি ও বিশ্লেষণগুলো 'স্বাভাবিক'ভাবেই অনুপস্থিত থেকেছে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে এমন কিছু অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের মুখোমুখি হয় যা অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠ্যসূচীর বাধ্যবাধকতার কারণেই এসব মাঠকর্ম সম্পাদন অনিবার্য হয়ে ওঠে। এসবের ভিত্তিতে গবেষণা অভিসন্দর্ভও দাঁড় করাতে হয়। শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদেরকেও এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। মাঠকর্ম সম্পাদন ও তার ভিত্তিতে লেখালেখি – পুরো প্রক্রিয়টি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমরা হই সে অভিজ্ঞতামালার যথেষ্ট বিশিষ্টতা রয়েছে। এদেশের প্রেক্ষাপটে একাডেমিক নৃবিজ্ঞান চর্চায় বর্তমান দশা কী বা প্রায় দুই দশকের পথ

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
† প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পাড়ি দেয়ার মধ্য দিয়ে এখানকার নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা কোন ধরনের রূপান্তর বা পালাবদলের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে প্রভৃতি বিষয়কে বোঝার উদ্দেশ্যে কোনো বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে গেলে শিক্ষার্থীদের এসব উপলব্ধিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করেছি।

এই মনে করা থেকেই নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেদের মাঠকর্ম ভিত্তিক যে অভিজ্ঞতা তার একটা বিশ্লেষণাত্মক বিবরণী দাঁড় করানোর এজেন্ডা নিয়ে শুরু করেছিলাম। এ প্রক্রিয়ায় যে সকল প্রশ্ন, সংশয় বা টানাপোড়েনের মুখোমুখি নিজেরা হই সেগুলোর উপস্থাপনকে স্থির করেছিলাম কর্তব্য কাজ হিসেবে। শিক্ষক হবার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রটির সাথে বিজড়নের যে মাত্রাগত বদল সেটির কারণে শিক্ষার্থী হিসেবে মুখোমুখি হওয়া ভাবনাগুলো খুব দ্রুত হয়তো আমাদের নিজেদের কাছেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে – এরূপ একটি আশঙ্কাও তৈরি হয়। ভয় ছিল যে বিষয়গুলো পুরোপুরি গুরুত্বহীন হয়ে না পড়লেও ভাবনার ভরকেন্দ্র অন্তত বদলে যাবে। সেটি ঘটবার আগেই এক সময় গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যাওয়া বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ তুলে ধরাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলাম। নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবৃতি দেয়াই ছিল এক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষক হবার পর শিক্ষার্থী 'অন্য'কে স্বর দেয়াটা উদ্দেশ্য ছিল না বরং শিক্ষার্থীর জায়গায় নিজেদের যে অবস্থান তার দিকে ফিরে তাকানোর প্রচেষ্টাই ছিল এখানে মূল বিষয়। নিজেদের একটি বিশেষ সময়ের উপলব্ধিকে উপস্থাপন করার উদ্যোগটি 'অন্যে'র কণ্ঠস্বর তুলে আনার মতো নাজুক ক্ষমতা-কেন্দ্রিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার সমার্থক নয় বলেই আমরা মনে করি।

যাই হোক, লেখাটি শেষ পর্যন্ত সূচনার ঐ এজেন্ডা থেকে সরে এসেছে। এ সরে আসা একটি গভীর উপলব্ধির ফলশ্রুতি। উপলব্ধিটির সারকথা হলো এই যেঃ শাস্ত্র নৃবিজ্ঞান এবং নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে চলমান সামগ্রিক আলাপচারিতা, কথামালা কিংবা তর্কাতর্কির সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট অথবা প্রোথিত হিসেবে না দেখে – স্বতন্ত্র, স্বশাসিত বা বিযুক্ত কোনো বিষয় হিসেবে জ্ঞানকাণ্ডীয় পরিমন্ডলের কোনো প্রসঙ্গকে বোঝা সম্ভব নয়। মূল জ্ঞানকাণ্ডীয় অবস্থানের সাথে যুক্ত না করে খণ্ডিতভাবে বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করা হলে সেটি হয়ে পড়তে পারে যথেষ্ট বিভ্রান্তিমূলক। এরূপ অনুধাবনের প্রেক্ষাপটে আমরা এ লেখার ফ্রেমটিকেই নতুন করে সাজাতে মনস্থির করি। বস্তুত এ

পরিবর্তিত ফ্রেমে সাজানো অনিবার্য বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। যদিও আমরা এখনও মনে করি, যে প্রাথমিক বোধ বা উদ্বেগ থেকে শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের বিশ্লেষণকে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম সেটি এই নতুন ভাবনা সঞ্চারের পরও তাৎপর্য্যহীন হয়ে পড়েনি। বিষয়টিকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছি বিধায়ই নিবন্ধের শুরুতে এই প্রাক-কথনের পর্যায়ে প্রসঙ্গটির অবতারণা করতে হলো। আমরা মনে করছি এ বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে এবং সেটিকে নৃবিজ্ঞানের মূল তাত্ত্বিক বিতর্কের সাথেও সংশ্লিষ্ট করে দেখা সম্ভব। এমনকি পরিবর্তিত এজেন্ডা হিসেবে আমরা যে বিষয়গুলোর বিস্তৃত আলোচনা এখানে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি তার সাথে সংশ্লিষ্ট করেও শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের উপলব্ধিগুলোকে বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু এ মুহূর্তে যেটি জরুরী এবং অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবীদার বলে মনে হয়েছে সেটি হলো জ্ঞানকাণ্ডীয় পরিমণ্ডলে চলমান বিতর্কের মাঝে নিজেদের স্থাপন করা।

আমাদের এই এজেন্ডা বদল সম্ভবত একাধিক অনুঘটকের প্রভাবে তরান্বিত হয়েছে; কিন্তু সব থেকে দৃশ্যমান প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে নৃবিজ্ঞান বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে গত ০৫ থেকে ০৭ জানুয়ারি, ২০০৫ এটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের অব্যবহতি পূববর্তী সময়ে আমরা প্রাথমিক অভীষ্ট লেখাটির একটা প্রাথমিক খসড়ার ওপর কাজ শুরু করি। কিন্তু তিন দিনের সম্মেলনের মাঝ থেকে যে বার্তা আমরা পাই তা আমাদেরকে এই সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য করে: নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা কিংবা ফিল্ডওয়ার্ক সংক্রান্ত যে কোনো ভাবনাকে নৃবিজ্ঞান ও এথনোগ্রাফিক ডিসকোর্সের সাম্প্রতিক যে দশা তার সাথে সম্পর্কিত করে দেখা জরুরী। বিশেষ করে বাংলাদেশের অবস্থান থেকে এসব বিষয়কে বোঝার ক্ষেত্রে যে দিকগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন তা হলো: বৈশ্বিকভাবে জ্ঞানকাণ্ডীয় পরিমণ্ডলে যে তর্কমালা চলমান রয়েছে তার সাথে আমরা নিজেদের কিভাবে যুক্ত করব, কতটুকু দূরত্ব বজায় রাখব অথবা কতটুকু উপেক্ষা করব। শাস্ত্র নৃবিজ্ঞান পৃথিবীব্যাপী যে প্রশ্নগুলো দ্বারা তাড়িত, আলোড়িত কিংবা আন্দোলিত হচ্ছে শাস্ত্র চর্চাকারী হিসেবে সে প্রশ্নগুলো থেকে কি আমরা সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে থাকব নাকি সেগুলোকে মোকাবেলা করে এগুবো –সেটি সুরাহা হওয়া জরুরী। যদি আমরা এ বিতর্কসমূহ ও টানাপোড়েনের সাথে যুক্ত হই

তাহলে সেই যুক্ততা বা সম্পৃক্ততার মাত্রা কী হবে? সুসংহত আলোচনা দাঁড় করানো জরুরী যে, সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে কিভাবে নির্ধারিত হবে আমাদের 'নিজস্ব' নৃবিজ্ঞান।

এই প্রেক্ষিতে আমাদের এক ধরনের দৃঢ় প্রত্যয় তৈরি হলো যে, নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু আগে প্রয়োজন এ ধরনের বিষয়গুলোকে মূল জ্ঞানকাণ্ডের তর্ক-বিতর্ক এবং টানাপোড়েনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখা। বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে, বিশেষ করে মাঠকর্ম, মাঠকর্মের উদ্দেশ্য, মাঠকর্ম ভিত্তিক জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে বিরাজমান প্রতাপশালী দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু সাম্প্রতিক প্রবণতা আমরা পাঠ করি (এই প্রবণতাসমূহের স্বরূপ কী সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি)। এসব থেকে আমাদের মনে হয়েছে সর্বাগ্রে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজনঃ আমরা কী করছি এবং কোন ভাবনা থেকে করছি? আমরা যা করছি তাকে কোন পরিপ্রেক্ষিত বা কোন বিশ্লেষণের কারণে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়? নৃবিজ্ঞানে চলমান বিতর্কসমূহের সাথে আমাদের এসব 'এন্টারপ্রাইজে'র যোগাযোগ কোথায়? সহজ কথায়, নিজেদেরকে বৃহত্তর জ্ঞানকাণ্ডীয় কথামালার মধ্যে স্থাপিত দেখা এবং এর মাধ্যমে নিজের দিকে ফিরে তাকানোর কাজটি আমরা কিভাবে করতে চাই সেটি কেন্দ্রীয় ভাবনার বিষয় হতে পারে বলে আমাদের উপলব্ধি হয়। এক্ষেত্রে আমাদের সচেতন থাকতে হচ্ছে যে, বৃহত্তর নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সের সাম্প্রতিক দশা কী তার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপন এবং একই সাথে বাংলাদেশের 'নৃবৈজ্ঞানিক জগত'-এ এসকল বিষয় সম্পর্কে কেমন ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন একটি নিবন্ধের পরিসরে প্রায় অসম্ভব। সে কারণে মূল শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলে যে সকল বিতর্ক চলমান রয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের দিকেই আমরা অধিক মনোযোগ দেব। বাংলাদেশে, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় এ সকল বিষয় নিয়ে আদৌ কোনো মজবুত পর্যালোচনাই যেহেতু নজরে আসে না সে কারণে এ ধরনের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণকেও আমরা গুরুত্ববাহী বলে বিবেচনা করেছি। যাই হোক, বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান চর্চা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আমরা পরে ফিরে আসব; তার আগে আমরা এই উপলব্ধির প্রেক্ষিতে এথনোগ্রাফি ও নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে চলমান আলাপমালার মাঝে নিজেদের স্থাপন করতে চাই।

এ লেখার গন্তব্য

প্রান্তের দেশের আমরা বিদ্যাজাগতিক চর্চায়ও প্রান্তিক। কেন্দ্রে উৎপাদিত জ্ঞান ঐতিহ্যের সাপেক্ষে আমাদের অবস্থান তৈরি হয়, বেড়ে ওঠে এবং আকার লাভ করে। পশ্চিমের একাডেমির তুলনায় আমাদের বিদ্যায়তনের অবস্থান যথাক্রমে পথ প্রদর্শক এবং পথ অনুসরণকারীর। বাংলাদেশে যদি আমরা নৃবিজ্ঞান চর্চার নিজস্ব ঘরানা বা এ দেশীয় 'জাতীয় ঐতিহ্য' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে যাই তাহলেও এ বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই সেটা করতে হয়। পশ্চিমের জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়া, বিশেষ করে, সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ও তত্ত্ব উৎপাদন আজ নানাভাবে প্রশ্নের মুখে পড়ছে। এই সমীক্ষণ বা বিচার-বিশ্লেষণের খড়গের নীচ দিয়ে যে জ্ঞানকাণ্ডগুলো যাচ্ছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো নৃবিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞানে আবার বিশেষ করে যে দিকটি চুলচেরা নিরীক্ষার মুখে পড়ছে সেটি হলো এথনোগ্রাফির মধ্য দিয়ে 'অন্য' সম্পর্কিত 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞান উৎপাদন ও সে জ্ঞানের 'পরিবেশন'। এসব বিশ্লেষণ বহু ক্ষেত্রেই পশ্চিমা পাণ্ডিত্য-ঐতিহ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য, বিদ্যাজাগতিক হেজিমনি, পীড়নমূলক ক্ষমতা

এখনও আছেন এবং প্রবলভাবেই আছেন।) এক সময়কার উপনিবেশ জনপদ বা পরবর্তীতে 'তৃতীয় বিশ্ব', 'উন্নয়নশীল' দেশ প্রভৃতি শিরোণামে বর্গীকৃত আমরা বর্তমানকার নব্য-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাতেও অনিবার্যভাবেই পরিধিতে অবস্থান করছি। সে কারণেই ইতিহাস ও ক্ষমতা-রাজনীতি কেন্দ্রিক এসব বিশ্লেষণগুলো থেকে আমরা বিযুক্ত থাকতে পারি না। তাছাড়া এ রকম পরিস্থিতিতে ঐ সকল তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি বা বিশ্লেষণের সবলতাগুলো পাঠ করার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে যখন স্থানীয় বা দেশজ নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার ঐতিহ্য তৈরির আহ্বান জানানো হয়, তখন এরূপ আশঙ্কাও তৈরি হয় যে এ ধরনের আহ্বানের পেছনেও হয়তো

রাজনীতি রয়েছে। যখন জ্ঞান জগতে চলমান আলাপচারিতায় বরং আমার উদ্বেগ, আমার অসন্তোষ (অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষোভ, ক্রোধ) এবং আমার অনুসন্ধিৎসাগুলো প্রতিধ্বানিত হয় তখন সেগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার ইঙ্গিত দেখা গেলে সন্দিহান হবার কারণ ঘটে। (বাংলাদেশের নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সে এ রকম একটি প্রবণতা প্রায়শই লক্ষ করা যায়। লেখালেখিতে সেটা ততটা সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত না হলেও আলাপচারিতা ও কথোপকথনে বহু ক্ষেত্রে এ প্রবণতাকে পাঠ করা যায়। তাছাড়া, যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনটির কথা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি সেখানেও এ ধরনের একটি অবস্থান বেশ জোরের সাথে দৃশ্যমান ছিল বলে আমরা পাঠ করি।) হ্যাঁ, সে বিশ্লেষণগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে, সেগুলোর মাঝে স্থাপিত থেকে তারপর নিজস্ব ইতিহাস ও অভিজ্ঞতায়, নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলো নিয়ে বোঝাপড়া দাঁড় করানো যদি হয় সারকথা তাহলে সেটি অর্থবহ হতে পারে। কিন্তু নিজস্ব ঐতিহ্য

যা কীনা এমনকি জ্ঞান-শাখা হিসেবে নৃবিজ্ঞানের অস্তিত্ব নিয়েও সংশয় তৈরি করছে। শাস্ত্র হিসেবে বেড়ে ওঠার নিজস্ব যে প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া তার কারণেই সম্ভবত এই জিজ্ঞাসাসমূহের সামনে নৃবিজ্ঞান নিজেকে অধিক উন্মোচিত বা আত্মরক্ষার ব্যূহহীন দেখতে পায়। অন্যথায় উত্তর-ঔপনিবেশিক বিশ্ব ব্যবস্থায় কম-বেশি সকল বিদ্যাশাস্ত্রই এক রকম অনিবার্যভাবে এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। নৃবিজ্ঞানে তাহলে এ সামগ্রিক সঙ্কটের স্বরূপ কী? বৈশ্বিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক বা ক্ষমতাকাঠামোগত কোন প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নসমূহ সূচীত হয় ও বিকশিত হয়? বিশেষ করে এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রে কিভাবে এ জিজ্ঞাসাগুলো প্রবল হয়ে ওঠে? সামগ্রিকভাবে বিদ্যাশাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞানে এসব বিতর্কের প্রভাব কি? এসকল আমূলবাদী জিজ্ঞাসার মাঝ দিয়ে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদনের সামগ্রিক

প্রক্রিয়া যেভাবে নাড়া খায় তার থেকে আমরা কতটা দূরে থাকি বা থাকতে পারি? এ সংক্রান্ত সমগ্র সাম্প্রতিক ডিসকোর্সকে আমরা কিভাবে পাঠ করব? – এসব প্রশ্নের মাঝে নিজেদেরকে স্থাপিত হিসেবে দেখা এবং এথনোগ্রাফির এ সকল সঙ্কটের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানকে বিশ্লেষণ করার তাগিদকে এ লেখা স্পষ্ট করতে চায়। এ লেখার অবস্থান হলো: একটি আলাপচারিতার সূচনা হওয়া আবশ্যক। এই সূচনাটিই হচ্ছে গন্তব্য, যেখানে এ নিবন্ধ পৌঁছাতে চায়।

সংকটের প্রকৃতি

প্রকাশনার প্রায় দু'দশক পরে এসে ক্লীফোর্ড ও মার্কুসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রাইটিং কালচার' শিরোনামের সংকলনটি (Clifford and Marcus 1986) আজ এথনোগ্রাফি, নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং পরিবেশন প্রসঙ্গে সব থেকে সুসংগঠিত এবং প্রভাবশালী আলোচনা বলে প্রতীয়মান হয়। এটি একটি পুস্তক, একটি সেমিনার প্রসিডিং এবং একই সাথে বহুলাংশে একটি মেনিফেস্টো (Kuper 1999: 206)। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্স নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন এবং নিরপেক্ষ-নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান উৎপাদনের প্রকল্পকে নৃবিজ্ঞানের অনিবার্য প্রকল্প বলে মনে না করাটা শুরু হয়েছে বহু আগেই। সেই সাথে আলাপ-আলোচনা চলে আসছে সেসব আবশ্যিকতাবাদী ভাবনাগুলোর অন্তর্নিহিত বিভ্রান্তিসমূহ উন্মোচন, সেগুলোর ব্যবচ্ছেদকরণ বা তার মাঝে গ্রথিত গলদগুলো চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে। নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও গবেষণার প্রকৃতি বিশ্লেষণ, সেই গবেষণা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে উৎপাদিত জ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন, উৎপাদিত জ্ঞানকে পাঠ করার উপায় বা পদ্ধতি অনুসন্ধান, নৃবিজ্ঞানীর সাথে তার 'মাঠ' ও মাঠের মানুষজনদের সম্পর্ক নিরীক্ষণ, নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও রাজনীতির আন্তঃক্রিয়া উন্মোচন অনেকদিন থেকেই চলছে। একই সাথে চলছে ক্ষমতাহীন মানুষের সংস্কৃতি অধ্যয়ন হিসেবে এ শাস্ত্রের অবস্থানকে ক্রিটিক্যালি দেখা, 'ইতিহাসহীন' (dateless/timeless-spaceless) মানুষ হিসেবে উপনিবেশিত মানুষজনের যে পাঠ এ জ্ঞানকাণ্ড উপস্থাপন করে আসছে তার অন্তর্নিহিত তাগিদকে বুঝতে চাওয়া, গবেষক নৃবিজ্ঞানী ও গবেষিত অন্যের সম্পর্কের ধরন বিশ্লেষণের চেষ্টা। এসব কিছু এক ভাবে শুরু হয়েছে বিগত শতাব্দীর ষাট দশকের শেষ লগ্ন থেকেই (Davies

1999: 11; Marcus 1986: 264)। এই বহুমুখী প্রশ্নমুখরতা, বিশ্লেষণী মনোভাব বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে নিয়ে সংশয় জ্ঞাপন নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডীয় পরিসরে তৈরি হওয়া বিচ্ছিন্ন বা স্বশাসিত কোনো বিষয় নয়। সামাগ্রিকভাবে সমাজ-সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে এবং সেই সূত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জগতে এবং পাণ্ডিত্যক্ষেত্রে এ সময় যে নতুন প্রবণতা ও বৃহত্তর বাঁক ফেরা লক্ষ্য করা যায় তার সাথে এই পালাবদল সংশ্লিষ্ট। এ হলো সে সব পরিবর্তন যেখানে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও প্রতাপশালী চিন্তা-ভাবনাকে প্রশ্নাতীত চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ না করে এর অন্ত র্গত রাজনীতি, মতাদর্শ এবং অসম ক্ষমতা সম্পর্ককে পাঠ করার ওপর জোর দেয়া হয়। নৃবিজ্ঞানের নিজের মধ্যেও বৃহত্তর সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি তথা পুরো বিশ্ব ব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া রূপান্তরগুলোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একই প্রভাব পড়ে রীতিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান চর্চার অন্যান্য শাখায়ও। দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, স্থাপত্যবিদ্যা এবং সামাজিক বিজ্ঞানগুলো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় এবং পালাবদল ঘটে তাদের মৌলিক অনুসিদ্ধান্তগুলোতে। এক ভাবে দেখলে নৃবিজ্ঞান মূলতঃ সাড়া দিতে চায় এই পুরো পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি এবং শেষ পর্যন্ত এই সামগ্রিক উপলব্ধির অংশ হিসেবে ফিরে তাকায় তার নিজের দিকে, নিজের অতীতের দিকে, নিজস্ব জ্ঞানতত্ত্বের দিকে।

এই আত্ম-সমীক্ষণ বা আত্ম-অন্বেষণের ফলশ্রুতিতে সূচীত হয় আত্ম-সমালোচনামূলক এক ধারা। এ ধারার অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের শক্তিশালী এথনোগ্রাফিক ঐতিহ্যকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়, যে প্রশ্নময় বিশ্লেষণের একটি সুসংহত প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে 'রাইটিং কালচার'। কিন্তু 'রাইটিং কালচার'ই একমাত্র কাজ নয় যেটি নৃবিজ্ঞানের 'এথনোগ্রাফিক লেখালেখির বর্গ'কে (ethnographic genre) নিয়ে সমালোচনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মূল ঘরানার অসম্পূর্ণতা দেখানো হয়েছে।

অন্যদিকে, এই ঘরানার বিশ্লেষণসমূহ যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাগুলো সামনে নিয়ে এসেছে তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছে বহুবিধ। এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রে, এথনোগ্রাফিক লেখালেখির ক্ষেত্রে এবং এথনোগ্রাফির পঠন-পাঠন নিয়ে ও এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম বিষয়ে এ ঘরানা যে বিশ্লেষণ দাঁড় করায় তার প্রতি নানামুখী সাড়া তৈরি হয়েছে।

এমন নয় যে সংস্কৃতি অধ্যয়ন বা সংস্কৃতির এথনোগ্রাফিক বয়ান কিভাবে বানানো হবে বা পাঠ করা হবে সে নিয়ে 'রাইটিং কালচার' এর বিশ্লেষণকে শেষ কথা বলে মনে করা হয়েছে। বরং এ ঘরানার বিশ্লেষণ নতুন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্রিয়তা, নতুন কর্মকাণ্ড এবং উদ্দীপ্ত বিতর্কমালার জন্ম দিয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই এই সক্রিয়তা থেকে উৎসারিত হয়েছে প্রাণময় সৃজনশীলতা এবং বহুমুখী কথামালা; সকল ক্ষেত্রে এর ফলাফল অনিবার্যভাবে নৈরাজ্যকর বা নৈরাশ্যময় হয়নি।

কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈশ্বিক ঐতিহাসিকতার স্রোতধারায় নৃবিজ্ঞান নিজেকে ক্রমশঃ এই সংকটময়তার মুখে এনে হাজির করেছে অথবা হাজির হতে বাধ্য হয়েছে, এই সংকটের প্রকৃত স্বরূপ কী, কিংবা সংকটের চালচিত্র স্পষ্ট হবার পর কিভাবে নৃবিজ্ঞানীরা এর সাথে যুক্ত হচ্ছেন, একে তারা কোন অর্থে গ্রহণ করছেন এবং তর্কাতর্কি, আমূলবাদী জিজ্ঞাসা কিংবা আত্ম-অনুসন্ধানের এই প্রবল স্রোতের মধ্য থেকে বিশ্লেষণ ও বোঝাপড়ার কার্যকর হাতিয়ারগুলো কিভাবে খুঁজছেন সেটি গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। পরিস্থিতি যেখানে পৌঁছেছে তাতে পৃথিবীর যে স্থানে বসেই 'নৃবিজ্ঞান' নামক শাস্ত্রের চর্চা করা হোক না কেন এই বিতর্কগুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও অবস্থান তৈরি না করে পারা যায় না। এগুলিই আজকের নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছে এসকল উপলব্ধি বা বিশ্লেষণের মাঝ দিয়ে না যেয়ে এগুলোকে কেবলমাত্র 'উন্নাসিক' উত্তরাধুনিকতাবাদ কিংবা নৈরাশ্যময়তার ঢালাও অভিযোগের 'বর্ম' ব্যবহার করে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা যায় শাস্ত্র চর্চাকারী হয়েও শাস্ত্রের চলমান প্রগাঢ় এসব টানাপোড়েন নিয়ে এ হলো এক ধরনের পলায়ন মনোবৃত্তি পোষণ। এসবের ফলাফল আর যাই হোক বিদ্যাজাগতিক চর্চার বিষয় হিসেবে নৃবিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়ার শক্তিশালী কোনো পথ তৈরি হয়নি।

দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই বিশ্লেষণগুলো বহুলাংশে উত্তরাধুনিকতাবাদী বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোকে কেবল 'উত্তরাধুনিক' হিসেবে সরল বর্গীকরণের নানাবিধ সংকট রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও বহুলাংশে সেটাই করা হয়েছে। লেখালেখির মাঝ থেকে এ সংক্রান্ত প্রমাণ হাজির করা দুরূহ, মুখ্যত এ কারণে যে এ সকল বিষয়ে যথেষ্ট লেখালেখিই হয়নি। কিন্তু কথোপকথন বা

আলাপচারিতাকে অনুসরণ করলে এরূপ একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অথচ সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন বিষয়টিকে যদি এভাবে বোঝা হয় যে, নৃবিজ্ঞানের বাইরে দর্শন, সাহিত্য, স্থাপত্যবিদ্যা অথবা অন্যান্য শাস্ত্রের পরিধিতে তৈরি হওয়া 'উত্তরাধুনিকতাবাদ' নামক এক চিন্তাস্রোত এসে নৃবিজ্ঞানের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে – তাহলে শাস্ত্রের ইতিহাসে যা ঘটেছে বা ঘটেছে তার বৃহৎ অংশই আড়াল হয়ে যায়।

ঘটনাটি কেবল সাধারণভাবে মানব চিন্তা বা দর্শনের বিকাশ সংক্রান্ত নয়, নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার নিজস্ব যে বিকাশ প্রক্রিয়া রয়েছে তা থেকেই এই সংকটের বেড়ে ওঠাকে বহুলাংশে ব্যাখ্যা করা যায়। হ্যাঁ, এও ঠিক যে মহাবয়ান বা গ্র্যান্ড থিওরিগুলো এবং সেগুলোর নির্মাণ প্রক্রিয়া যখন তোপের মুখে পড়ে তখন ঐ সকল মহাবয়ানের অন্যতম নির্মাতা এবং পরিপোষক হিসেবে নৃবিজ্ঞান তাতে অনিবার্যভাবে নাড়া খায়। পরিবর্তিত ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বদলে যাওয়া জ্ঞান তৃষ্ণার প্রতি কিভাবে সাড়া দেবে, কিভাবে নতুন পরিস্থিতির জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন প্রশ্ন তৈরি করবে বা কিভাবে তার নিজের গতিপথ স্থির করবে ইত্যাক্যার প্রশ্নগুলো ঐতিহাসিক অনিবার্যতা হিসেবেই নৃবিজ্ঞানের সামনে হাজির হয়।

সংকটাপন্ন, শাস্ত্র নিজেই

আলোড়ন কেবল এথনোগ্রাফিকে ঘিরে নয়। বস্তুত নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং শাস্ত্র নৃবিজ্ঞান নিজেই গভীরভাবে নাড়া খেয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞানকাণ্ডটির ভিত্তিমূল নিয়ে দৃঢ় ও সুসংগঠিত প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞানকাণ্ডটির অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই জটিল পরিস্থিতির ক্যানভাসও বহু বিস্তৃত। ১৯৯৯ সালে এসে হেনরিয়েটা মুর লিখছিলেন যে, বিশ শতকের শেষ দশকে সংকট বরং আরও গাঢ়তর রূপ নেয় এবং প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় একদমই নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে। খুঁজে দেখার তাগিদ প্রকাশিত হয় যে আদৌ এ জ্ঞানের কোন প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে কিনা (Moore 1999:1)। সমসাময়িক বিদ্যাক্ষেত্র ও চিন্তাজগতে প্রবল কিছু প্রশ্নের সাথে এভাবে সূচীত শাস্ত্রীয় আত্ম-সমীক্ষা যুক্ত হয়ে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যেখানে 'নৃবিজ্ঞান' নামক প্রকল্পটিই পরিত্যাজ্য বলে মনে হতে পারে। মুরের পর্যবেক্ষণ এখানে সরাসরি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> "নৃবিজ্ঞানীকে এবং জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীর ভূমিকাকে তাত্ত্বিক সমালোচনার প্যারামিটারের আওতায় আনা হলো এবং এর প্রভাব পড়লো বহু ক্ষেত্রে। একটি প্রভাব হলো এই যে ক্ষমতা, আধিপত্য এবং বৈষম্যের প্রশ্নসমূহ ব্যবহারজীবী বা চর্চাকারীদের ব্যক্তিক বা সামষ্টিক নীতি-নৈতিকতাকে যেভাবে আন্দোলিত করে তার সাথে নৃবিজ্ঞানকে যুক্ত করা হলো। ফলাফল হলো বহুমাত্রিক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি কেবল তত্ত্ব থেকে পিছু হটে আসার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ক্ষান্ত হয় না; এমনকি খোদ নৃবৈজ্ঞানিক প্রজেক্ট থেকে পশ্চাদপসারণের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে (Moore 1999)।"

নৃবিজ্ঞানের প্রাজ্ঞ দিকপাল যারা, বলা যায় নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার মহানায়কগণও সংকট যে গভীর সেটি পাঠ করলেন। মার্শাল সালিনস ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত "How Natives Think: About Captain Cook, For Example" শিরোনামের লেখার তাঁর হতাশাকে ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে নৃবিজ্ঞান নামক জ্ঞানকাণ্ডটি তার ক্যারিয়ারের 'গোধুলিলগ্ন' পার করছে। অন্যদিকে, ক্লীফোর্ড গিয়ার্জ এক সাক্ষাৎকারে আরও সুনির্দিষ্টভাবে দাবী করেন মোটামুটি আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এ শাস্ত্রটিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে (cf. Moore 1999:20)। জোহানেস ফাবিয়ন (Fabian 1983) তার কাজে শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞানের মধ্যে এবং নৃবৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফিতে 'অন্য' নির্মাণের প্রক্রিয়ায় যে সংকটময়তাকে তৈরি করা হয়েছে সেটি উন্মোচন করেছেন; হেনরিকা কুকলিক (Kuklick 1991) ব্রতী হয়েছেন ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের অন্তর্গত রাজনীতি উন্মোচনে; কুপার (Kuper 1988) দেখিয়েছেন 'আদিম সমাজ' বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মোহাচ্ছন্নতার স্বরূপ কী; তালাল আসাদ (Asad 1973) তুলে ধরেন ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক সহগামিতর চিত্র। এরা সকলে যে নৃবিজ্ঞান নামক প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে সমানভাবে সংশয়াকীর্ণ তা নয়; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের নৃবিজ্ঞান যে এ সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে নতুন করে কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে তা নিয়ে এদের নিজস্ব বিশ্লেষণ রয়েছে। কিন্তু এদের কাজের একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব হলো এই যে এসব শক্তিশালী কাজের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিনের নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঐতিহ্য ও জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রশ্নের মুখে পড়ে। প্রায় একশ' বছরের নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্ব এবং

উৎপাদিত জ্ঞানের পরিবেশন প্রক্রিয়া যে বহুমুখী সীমাবদ্ধতায় পূর্ণ ছিল সেটি এসব কাজের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কারস্টেন হ্যাসরাপের সমগ্র বিতর্কের মাঝে নিজেকে হাজির রখেন, সেই বিতর্কের আলোয় নিজের অভিজ্ঞতাকে দেখেন এবং একই সাথে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কাজের নিজস্ব যে অভিজ্ঞতা তার আলোকে তাত্ত্বিক বিতর্কগুলোকে বুঝতে চান। এভাবেই তিনি সংকটের মধ্যে থেকে উত্তরণের পথ খোঁজেন। হ্যাসরাপ এ সমস্যাকে নানাভাবে পাঠ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন এ সময়টি হলো নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বীয় অনিশ্চয়তার কাল (Hastrup 1995: 7)। কেউ কেউ একে চিহ্নিত করেছেন নৃবিজ্ঞানের আত্মবিশ্বাসের সংকট (the crisis of anthropological confidence) হিসেবে (Barnard and Spencer 1996: 141)। অন্যদিকে, নৃবিজ্ঞানে উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অ্যাডাম কুপার বলেছেন, "... উত্তরাধুনিক আন্দোলন নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডে এক ধরনের পক্ষাঘাতগ্রস্ততার অসহায়তা নিয়ে এসেছে। ... এর মূল প্রভাব হয়েছে এই যে তরুণ এথনোগ্রাফাররা এখন এতটাই বিচলিত এবং সন্ত্রস্ত যে তাদেরকে মোটের উপর মাঠে যেতে রাজি করানোই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে (Kuper 1988)।"

'বৈজ্ঞানিক', 'নিরপেক্ষ' জ্ঞান উৎপাদন প্রকল্পের সমাপ্তি: এথনোগ্রাফির জগতে 'উত্তরাধুনিকতাবাদে'র অভিঘাত নাকি প্রাক-উত্তরাধুনিক রূপান্তর?

'উত্তরাধুনিকতাবাদ কী' সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার কোন ইচ্ছে এ লেখায় আমাদের নেই। বস্তুত সেটি এ পরিসরে জরুরী নয় এবং সম্ভবও নয়। সরল কথায় বললে এ এমন এক অবস্থান যেটি মানব আচরণ বিষয়ে কোন স্বতঃসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাতত্ত্ব-এর সম্ভাবনা নিয়ে ক্রমাগত সন্দেহ তৈরি করে। মানুষ, মানুষের আচরণ, তার সমাজ-সংস্কৃতি, সভ্যতা নিয়ে তৈরি হওয়া জ্ঞান চূড়ান্ত, একক, অখণ্ড কোন সাধারণ সত্যের সন্ধান দিতে সক্ষম নয় – এক কথায় এই হলো মূল বক্তব্য যেটিকে নানাভাবে উপস্থাপন করে উত্তরাধুনিকতাবাদ। ইউরোপরীয় সভ্যতায় বিকাশ প্রক্রিয়ায় আলোকময়তার যুগ হতে নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান তৈরির যে ঐতিহ্য দাঁড়িয়েছে সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিপরীতে উত্তরাধুনিকতাবাদ নিজেকে দাঁড় করায়। দৃষ্টবাদী বিজ্ঞান

চেতনা হতে উৎসারিত সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলনীতিসমূহই বস্তুতপক্ষে এভাবে উত্তরাধুনিক চিন্তাপ্রবাহ দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো মানবিক বিজ্ঞানসমূহও (human sciences) পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে বা পৃথিবীজোড়া প্রপঞ্চসমূহ সম্পর্কে জানতে পারে এবং এভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য সকল বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত সত্য কী সেটি খুঁজে বের করা সম্ভব – এই যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ধারণা, একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে এটি নৃবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে। 'অন্য' সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এই সূত্রে নৃবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক সত্য খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করে এবং বৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফি রচনায় মনোনিবেশ করে। এথনোগ্রাফার গবেষিত জনগোষ্ঠীর জীবনের সকল দিকগুলো অনুসন্ধান করবেন এবং সেখানে তাদের জীবধারা, সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ বা প্রতিষ্ঠানসমূহে কী আইন, কী সূত্র বা কী সম্পর্কসমূহ রয়েছে তা তিনি খুঁজে বের কররেন। এটি যে সম্ভব তা নিয়ে একটা সময় নৃবিজ্ঞানীদের বিশেষ কোন সংশয় ছিল না। বরং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনো একটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার কার্য-কারণ তুলে ধরা সম্ভব বলে তারা বিশ্বাস করেছেন এবং সেটি করার জন্যই তারা এথনোগ্রাফি করেছেন। নৃবিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের এ বিশ্বাসের কথা তারা সাড়ম্বরে প্রচারও করেছেন। ম্যালিনোস্কি তাঁর বিখ্যাত ক্ল্যাসিক "Argonauts of the Western Pacific" – এ এই বৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফির রূপরেখা বেশ জোরের সঙ্গেই তুলে ধরেন।

ম্যালিনোস্কির এ গ্রন্থের বহুল পঠিত এবং বহু উদ্ধৃত ভূমিকার (Malinowski 1978[1922]:1-25) শিরোনাম হচ্ছে "অনুসন্ধানের বিষয়, পদ্ধতি এবং পরিধি"। এখানে তিনি এথনোগ্রাফিক গবেষণায় কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় এবং কিভাবে এ পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ট্রাইবাল জীবনের 'সত্য'কে উদঘাটন করা সম্ভব সে নিয়ে সুনির্দিষ্ট 'দিকনির্দেশনা' তুলে ধরেছেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বোধ ও চেতনা যে কিভাবে এথনোগ্রাফিকে তাড়িত করে তার প্রমাণ সবিস্তারে হাজির রয়েছে এ ভূমিকায়। দীর্ঘ উদ্ধৃতির লোভ নিবারণ করা বেশ কষ্টকর। এখানে তিনি ফলপ্রসূ মাঠকর্মের রহস্য তুলে ধরেন, তিনি কথা বলেন সেই 'যাদুমন্ত্র' প্রসঙ্গে যার বলে এথনোগ্রাফারের পক্ষে সম্ভব হয় নেটিভদের প্রকৃত অবস্থাকে তুলে আনা, তুলে ধরা সম্ভব হয় ট্রাইবাল জীবনের 'সত্য' চিত্র:

"আর সব কিছুর মতো এক্ষেত্রেও সাফল্য কেবল আসতে পারে সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক মূলনীতিগুলোর ধৈর্য্যেশীল ও সুশৃঙ্খল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে..." (Malinowski 1978 [1922]: 6)। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য (real scientific aim) থাকাটা হলো মূলনীতিগুলোর মধ্যে প্রথম। এ প্রসঙ্গে সরাসরি ম্যালিনোস্কিকে উদ্ধৃত করা যাক:

> "এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মের প্রথম ও মৌলিক আদর্শ হলো সামাজিক গঠন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় চিত্র তুলে ধরা। সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিরাজমান নিয়মনীতি ও বিধি-বিধানকে সুস্পষ্টরূপে উন্মোচন করতে হবে.... নেটিভরা মানুষের তুলনায় বিকৃত বা শিশুতুল্য প্রাণী – এরূপ উপস্থাপন সহ্য করার দিন শেষ হয়ে গেছে। এ ধরনের চিত্রিতকরণ মিথ্যা। অন্যসব মিথ্যাচারের মতো এই মিথ্যাচারেরও মৃত্যু রচিত হয়েছে বিজ্ঞানের কারণে...."

বৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফির গঠন এবং এর গুরুত্ব নিয়ে তিনি এ ভূমিকায় সুস্পষ্ট মত দিয়েছেন যে, সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফিতে লেখকের কল্পনা বা অন্তর্দৃষ্টির সাথে সরাসরি পর্যবেক্ষণকে ঘুলিয়ে ফেলা হয় না। নেটিভদের নিজস্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে এক দিকে রাখতে হবে এবং এথনোগ্রাফারের অনুমিতি থেকে সেটিকে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করতে হবে।

এভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক চিত্রের ধারক হিসেবে এথনোগ্রাফিকে বোঝা এবং সেভাবে এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম সম্পাদন ও এথনোগ্রাফি লেখার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে দীর্ঘদিন। নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্মের 'হলমার্ক' বলে বিবেচিত 'অংশগ্রহণমূলক নিরীক্ষা' প্রতিষ্ঠিত ও সংজ্ঞায়িত হয় এই দৃষ্টবাদী বিজ্ঞান চেতনা থেকেই। পদ্ধতিবিদ্যার সিংহ সোপান হিসেবে এই অংশগ্রহণমূলক নিরীক্ষাকে গ্রহণ করার পেছনে একটি প্রধান ধারণা হলো এই যে, অন্য একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোঝা সম্ভব হতে পারে যদি ঐ সংস্কৃতির চর্চাকারীর যে অভিজ্ঞতা সে একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গবেষকও যেতে পারেন। রেডক্লীফ-ব্রাউনের কাজে এ ধরনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় বিশ্বাসের বিষয়টি সম্ভবত সব থেকে কট্টর রূপে প্রকাশ পায়। এই ধারা বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়েছিল ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানে। এই বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণযোগ্যতা বা সীমাবদ্ধতা

প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংহত কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। ক্রিয়াবাদী-কাঠামোবাদী পদ্ধতিবিদ্যা নিয়ে এক পাবলিক বক্তৃতায় ইভান্স-প্রিচার্ড (Evans-Pritchard 1991[1951]) তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন ক্রিয়াবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে। সেটি ছিল বৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফিক জ্ঞান উৎপাদন প্রসঙ্গে প্রথম কোনো সুসংহত প্রশ্ন উত্থাপন। তিনি বিশেষ করে প্রশ্ন তোলেন সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে জায়গা করে দিতে ক্রিয়াবাদের যে প্রচেষ্টা সেটির যথার্থতা নিয়ে। তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন: নৃবিজ্ঞান কি একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (a natural science) নাকি একটি মানবিক শাস্ত্র (a humanity) ?

ইভান্স-প্রিচার্ডের এই জিজ্ঞাসা একভাবে সমর্থন পেয়েছে ল্যাভি-স্ট্রসের সস্যুরিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোবাদের প্রভাবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রশ্নে সব থেকে গুরুতর সব বক্তব্য হাজির হয় যার লেখালেখির মধ্যে তিনি হলেন ক্লীফোর্ড গিয়ার্জ। দীর্ঘ ও নিবিড় অংশগ্রহণ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক কৌশল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্যের সমাজ-সংস্কৃতিকে সমগ্ররূপে জানার যে ভাবনা তা নিয়ে চূড়ান্ত সংশয় প্রকাশিত হয় গীয়ার্জ যখন বলেন যে, আমাদের পক্ষে অন্যের জীবন যাপন করা সম্ভব নয় এবং সেটা করার চেষ্টা করাও প্রশংসনীয় কিছু নয় ([we] cannot live other people's lives, and it is a piece of bad faith to try. (Geertz 1986: 373 cf. Kohn 1994:21)।

বিজ্ঞান হয়ে ওঠার অদম্য প্রয়াস নিয়ে সংশয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো 'বৈজ্ঞানিক', 'নিরপেক্ষ', 'নৈর্ব্যক্তিক' সত্য অনুসন্ধানকারী শাস্ত্র হিসেবে নিজেদের শাস্ত্রকে দেখতে চাওয়া নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের ক্রমাগত সন্দিহান হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় নৃবিজ্ঞান এভাবে তার আধুনিক পূর্বসূরিতাকে খুব জোরালোভাবে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

বস্তুত নৃবিজ্ঞানের নিজের তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতসমূহের মাঝে যে বদল চলমান ছিল সেটির এক প্রকারের ধারাবাহিকতা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায় বিশ্লেষণ ও বোঝাপড়ার এই সমালোচনামূলক ও 'সংশয়ধর্মী' ধরনকে। জোহান্‌নেস ফাবিয়ান (Fabian 1992) যেমন সুস্পষ্টরূপে এথনোগ্রাফি-কেন্দ্রিক সমালোচনাগুলোকে শাস্ত্র নৃবিজ্ঞানের নিজস্ব বিকাশের অংশ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, যে সকল নৃবিজ্ঞানীদের শক্তিশালী সমালোচনা নৃবিজ্ঞানের এথনোগ্রাফিক

ঘরানার উল্লেখযোগ্য সংকটগুলোকে খুবই শক্তিশালীরূপে এবং সাফল্যের সঙ্গে সামনে তুলে এনেছে ফাবিয়ান তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দের একজন বলে বিবেচিত হন। ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রকাশিত এই ওলন্দাজ নৃবিজ্ঞানীর "Time and the Other" শিরোনামের গ্রন্থটি (Fabian 1983) নৃবিজ্ঞানের এথনোগ্রাফিক ঐতিহ্য বিষয়ে একটি তুখোড় সমালোচনা গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও পঠিত। গ্রন্থটি ক্রিটিক্যাল নৃবিজ্ঞানের সংশ্লেষ (সিনথেসিস) হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেকেই একে প্রশংসা করেছেন নৃবৈজ্ঞানিক প্রকল্পের একটি নতুন দিগন্ত-সূচনাকারী সমালোচনা হিসেবে। কারও কারও দৃষ্টিতে এটি হলো 'নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ইতিহাসে মাইলফলক' (Bunzl 2002)। ফাবিয়ানের এই অতি আলোচিত কাজটির পর্যালোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং এহেন বিখ্যাত ফাবিয়ান নিজে পরবর্তীতে নৃবিজ্ঞান ও এথনোগ্রাফির এরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হওয়া বা সংকটগ্রস্ত হওয়াকে কিভাবে দেখেছেন সেটির প্রতি মনোযোগ দিতে আমরা আগ্রহী।

২০০১ সালে পুনর্মুদ্রণ সংস্করণের ভূমিকায় তিনি জানিয়ে দেন যে কিছু পাঠক যদিও মনে করেছেন যে 'টাইম অ্যান্ড দি আদার'-এর মধ্য দিয়ে এথনোগ্রাফির এক ধরনের অবসান ঘটে, তাদের সেই ধারণা ভ্রান্ত বলেই প্রমাণ হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের এই ক্রিটিক সত্ত্বেও তার পক্ষে পুরোনো এথনোগ্রাফিক প্রজেক্টগুলোকে নিয়েই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং নতুন এথনোগ্রাফিক প্রজেক্টও তিনি গ্রহণ করেছেন। 'টাইম অ্যান্ড দি আদার'-এর প্রকাশ পরবর্তীকালীন অন্য একটি লেখায় তিনি ক্রিটিকালিটি এবং রিফ্লেক্সিভিটিকে নৃবিজ্ঞানের একটা স্বাভাবিক দশা হিসেবে দেখেছেন (Fabian 1992)। এটি কোন অনন্যসাধারণ বিষয় নয়, অথবা নয় কোন দার্শনিক বিশেষায়ণও। তার দৃষ্টিতে সমালোচনা শেষ কথা নয় বা সব কিছুর চূড়ান্ত দশাও নয় এবং কেবল সমালোচনার কোনো প্রাসাদ দীর্ঘ দিন টেকেও না। সমালোচনা হলো মাঝে মাঝে নিজের নিঃশ্বাসটিকে চেপে রাখার মতো, যেটি আসলে নিজেকে সচল রাখার জন্যই প্রয়োজন (ibid.:x)।

নৃবিজ্ঞানের উত্তরাধুনিক পর্যায়ে উপনীত হওয়া সংক্রান্ত প্রচারণাকে তিনি বিরক্তিজনক ও বাড়াবাড়ি *(ad nauseam)* হিসেবে চিহ্নিত করেন। নৃবিজ্ঞানে উত্তরাধুনিকতা নিজের উপস্থিতিকে যেভাবে দেখে সেটা তার বিবেচনায় এক ধরনের ভনিতা। উত্তরাধুনিক সমালোচনা এমনভাবে নিজেকে নৃবিজ্ঞানের মধ্যে

দেখে যে, এ ধরনের সমালোচনা এ জ্ঞানকাণ্ডে অনেক দেরীতে এসে পৌঁছেছে। ফাবিয়ানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী নৃবৈজ্ঞানিক উত্তরাধুনিকতার নিজের সম্পর্কে এই ভাবনা একটি ভ্রান্তি। তিনি তার কাজের (ibid.) মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদনে নৃবিজ্ঞানের সক্ষমতা নিয়ে বিশ্বাসহীনতা কোনভাবেই 'লিটারেরি ডিকনস্ট্রাকশন' ধারা কর্তৃক এথনোগ্রাফিক অথরিটিকে খারিজ করার মধ্য দিয়ে সূচীত হয় নি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদনের অক্ষমতার কথা নৃবিজ্ঞানে বহু আগেই এসেছে, নৃবৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে এ প্রশ্ন প্রথম উত্থাপনের কৃতিত্ব কোনোভাবেই সাহিত্যিক অনির্মাণবাদিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত উত্তরাধুনিক বিশ্লেষকদের নয়, যেমনটি এ নিবন্ধে আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। এটি প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে এথনোগ্রাফারদের নিজস্ব উপলব্ধির মধ্য দিয়েই: যখন তারা বুঝতে পারল যে ধরনের জ্ঞানের সন্ধান তারা করছে সেটির উৎপাদন বা ব্যাখ্যাকরণ কোনটিই দৃষ্টবাদী নিয়মনীতি দ্বারা চালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সম্ভব নয় তখনই এই বিশ্বাসহীনতার সূচনা; এবং এটা হয়েছে উত্তরাধুনিকতাবাদী বিশ্লেষণসমূহ দৃশ্যপটে আসার বহু আগেই। কারণ, বিজ্ঞানবাদী উপস্থাপনার সমালোচনার লক্ষ কোনভাবেই আধুনিকতার পুরো প্রজেক্টকে খারিজ করে দেয়া ছিল না, যেটা কীনা উত্তরাধুনিকতাবাদের লক্ষ। বরং লক্ষ ছিল বিজ্ঞানের একটি আদর্শ, যে আদর্শ নির্মিত হয়েছিল ষোড়শ শতকে। ফাবিয়ানের মতে, পরবর্তীতে উত্তরাধূনিকতাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে সে অর্থে এথনোগ্রাফারের ঐ বিশ্বাসহীনতা অবশ্যই উত্তরাধুনিক ছিল না; এটি সীমিত অর্থে ঐ পর্যন্ত উত্তর-আধুনিক ছিল যে এটি ছিল উত্তর-নিউটনিয়ান।

ফাবিয়ান আরও সুস্পষ্টরূপে বলেছেন: "দৃষ্টবাদের এই সমালোচনাই (নৃবিজ্ঞানে) দুটো 'বাঁক ফেরা' প্রথম নিয়ে আসে যে বাঁক পরিবর্তনগুলোকে ভ্রান্তভাবে উত্তর-আধুনিকতাবাদের ফলাফল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ("It was this critique of positivism that first brought about two 'turns' that are now wrongly ascribed to post-modernism.")। ফাবিয়ানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী একটি পরিবর্তন হলো: 'ভাষার দিকে বাঁক ফেরা' ('turn to language') এবং অপরটি হচ্ছে 'আত্মচরিতের দিকে বাঁক ফেরা ('turn to autobiography')। ভাষার দিকে যে বাঁক ফেরা তার ফলে এথনোগ্রাফিকে একটি সংলাপ এবং যোগাযোগ বলে মনে করা হলো এবং অনিবার্যভাবে আমরা বাধ্য হলাম

এথনোগ্রাফি যে *'টেক্সট'* সে বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় বলে বিবেচনা করতে; আর এ থেকেই উপলব্ধিটা তৈরি হলো যে নৃবিজ্ঞানকে তাহলে একটি ব্যাখ্যানমূলক শাস্ত্র বা ইন্টারপ্রেটিভ সায়েন্স হতে হবে। অন্যদিকে, আত্মচরিত-এর দিকে বাঁক ফেরাটা ঘটেছে এই জ্ঞানতত্ত্বীয় প্রয়োজন থেকে যে, এথনোগ্রাফিক নৈর্ব্যক্তিকতার মাঝে আত্মমাত্রিকতাকেও (সাবজেক্টিভিটি) যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। – এভাবে তিনি দেখাতে চান যে, নৃবিজ্ঞান যে আজকে উত্তর-আধুনিক হয়েছে বলে বলা হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক এবং জ্ঞানতত্ত্বীয় কারণ। বিষয়টি সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে বুঝতে হবে।

এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে নৃবিজ্ঞানে অধুনিকতার যে 'উত্তরকাল' তার একটি নিজস্ব (জ্ঞানকাণ্ডীয়) ভূগোল রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব চেহারা, নিজস্ব ধরন, নিজস্ব বেড়ে ওঠা (যদিও অবশ্যই সেটি বৃহত্তর বিকাশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয় বা তার প্রভাবমুক্ত নয়)। কী সেই নিজস্বতা বা নিজস্বতার ধরন? সুনির্দিষ্টভাবে বললে গিয়ার্জিয়ান 'ইন্টারপ্রেটিভ' নৃবিজ্ঞানের যে ভাবনা সেটির প্রভাবে তৈরি হয় এথনোগ্রাফি এবং নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদন প্রসঙ্গে সমকালীন অধিকাংশ বিশ্লেষণ, তৈরি হয় প্রভাবশালী 'কালচারাল ক্রিটিসিজম' এর প্রবণতা, এমনকি 'রাইটিং কালচার'ও যে মুখ্যত এই চেতনা থেকে উৎসারিত তা সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে রাবিনাউ (Rabinow 1986), মার্কুস (Marcus 1986) এবং জেমস ক্লীফোর্ডের (Clifford 1986) বিশ্লেষণে।

অ্যাডাম কুপার স্পষ্ট করে বলেছেন গিয়ার্জই এই 'রাইটিং' এন্টারপ্রাইজের জন্মদাতা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন, যদিও তার অবস্থানের সীমাবদ্ধতা নিয়েও এ ধারার বিশ্লেষকরা কথা বলেছেন। কখনো কখনো তিনিও সমালোচিত হয়েছেন এদের দ্বারা; তারই কাজ দ্বারা একভাবে অনুপ্রাণিত 'সাহসী নতুন'দের দ্বারা নিকট তিনি ভর্ৎসনার শিকারও হয়েছেন। তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এই বলে যে, তিনি বহু সম্ভাবনাময় বিশ্লেষণের দ্বার উন্মোচনের কাছাকাছি গিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পিছু হটে এসেছেন।

অন্যত্র যেমন ক্লিফোর্ড গিয়ার্জ প্রসঙ্গে আলোচনায় কুপার লিখছেন যে, গিয়ার্জের ইন্টারপ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ গড়ে উঠেছে দৃষ্টবাদী সামাজিক বিজ্ঞানকে বাতিল করার মধ্য দিয়ে (... interpretative approach, dismissive of positivist

social sciences...)। গিয়ার্জ তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানকে পজেটিভিজম এবং বিহ্যাভিয়রিজম থেকে ক্রমশ ইন্টারপ্রিটেশনের দিকে চালিত করেন এবং এ পরিবর্তনকে স্বাগত জানান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মডেলসমূহ ক্রমশ পরিত্যাক্ত হয়। ১৯৭৩ সালে তিনি লিখলেন যে, "কেবল নৃবিজ্ঞানে নয়, সাধারণভাবে সামাজিক অধ্যয়নের সকল শাখায়ই বিপুল পরিমাণে আগ্রহ তৈরি হয়েছে মানুষের জীবনে প্রতীকী বিষয়াদির ভূমিকার বিষয়ে। অর্থ (অর্থ অন্বেষণ) ... এখন আমাদের জ্ঞানকাণ্ডের মূল বিষয় (Geertz 1973:29)।"

এর দশ বছর পরে তাঁর Local knowledge শিরোনামের প্রবন্ধ সংকলনে (Geertz 1983) গিয়ার্জ একটি নতুন ধরনের বহুজ্ঞানকাণ্ডীয় ব্যবস্থার কথা বলেন যেখানে তিনি ইন্টারপ্রেটিভ, প্রতীকী নৃবিজ্ঞানকে দর্শন ও সাহিত্য তত্ত্বের সাথে যুক্ত করে দেখেন (a new interdisciplinary configuration, in which interpertive, symbolic anthropology was linked to philosophy and literary theory)। তার দৃষ্টিতে যে সকল সমাজবিজ্ঞানীরা সময়ের সাথে অগ্রসর হচ্ছেন সাদৃশ্য বা তুলনাগুলো তারা খোঁজ করছেন বেশি বেশি করে সাংস্কৃতিক পরিসম্পাদনার বিভিন্ন কৌশল যেমন- থিয়েটার, চিত্রকলা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, আইন, নাটক প্রভৃতির ভেতর থেকে; ভৌতিক কৌশলাদি থেকে উপমা বা সাদৃশ্য এখন আর নেয়া হয় না। সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞান এভাবে ক্রমশ যুক্ত হয় মানবিকী শাস্ত্রসমূহের সাথে। জ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করার মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া পুরোনো যে শ্রেণীবিভাজন তার সীমারেখা এ ধরনের সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট হতে থাকে। অনেক পরে ১৯৯৫ সালে তাঁর আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ "After the fact" – এ তিনি তার উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেন এভাবে: "অর্থ অন্বেষণ বিষয়ক যে মোড় সেটি একটি যথার্থ বিপ্লব বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ বিপ্লব সুদুরপ্রসারী, দির্ঘস্থায়ী, উত্তাল এবং তাৎপর্যপূর্ণ (Geertz 1995: 115)।"

অন্যদিকে, গিয়ার্জকে পাঠ করতে হবে প্রতীকী নৃবিজ্ঞানের বৃহত্তর ধারার মধ্যে। এই ধারা আবার লেভি-স্ট্রসীয়ান কাঠামোবাদী ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। লেভিস্ট্রসের কাঠামোবাদ আবার ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যার কেন্দ্রে

রয়েছেন ফার্ডিনান্ড সস্যুর। এভাবে নৃবিজ্ঞানের উত্তরাধুনিকতা বুঝতে গেলে এটিকে যুক্ত করে দেখতে হয় এই জ্ঞানকাণ্ডের অভ্যন্তরে নিজস্ব বিকাশ ধারায় যে 'প্রাক-উত্তরাধুনিক' পর্যায় রয়েছে সেটির সাথেও (Nugent 1996: 442)। এ পর্যায়টিকে সংক্ষেপে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ব্যাখ্যামূলক ঐতিহ্য' (interpretative tradition) হিসেবে। এ ধারাই নৃবিজ্ঞানে ব্যাখ্যাতত্ত্ব বা hermeneutics এর সূচনা করে। এই ইন্টারপ্রিটেটিভ ধারার অংশ হিসেবেই পরে জন্ম নেয় সংস্কৃতির পাঠকে টেক্সুয়ালিটি, রাইটিং, কালচার ক্রিটিক, টেক্সুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, অথরিটি, রিফ্লেক্সিভিটি প্রভৃতি ধারনা ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখার প্রবণতা। পুরো বিষয়টাকে অবশ্য জর্জ মার্কুসের অনুসরণে আবার চিহ্নিত করা যেতে পারে "postwar hermeneutic" হিসেবে (Marcus 1986)।

বিদ্যায়তনিক শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞানের মধ্যে চলমান এ সকল পরিবর্তমান উপলব্ধি সম্পর্কে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান যথেষ্ট ওয়াকিবাল থেকেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। এ আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্ট করা হয়েছে তা হলো: জ্ঞান উৎপাদন, পরিবেশন বা উৎপাদিত জ্ঞানের পাঠ কীভাবে পাঠ করা হবে সে বিষয়ে যে সকল বিশ্লেষণ সাম্প্রতিক সময়ে সামনে এসেছে সেগুলোকে প্রধানত বুঝতে হবে নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সের ইতিহাসের আলোকে। উত্তর ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় ভূ-রাজনীতি, সমাজ-সম্পর্ক, পশ্চিম-অপশ্চিমের আপেক্ষিক অবস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। 'আদিম', 'অ-ইউরোপীয়', 'প্রাক-শিল্পায়িত' বা 'সরল' সমাজগুলো সম্পর্কে যে সকল মুখ্য অনুসিদ্ধান্তকে ঘিরে শুরুর প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান নির্মিত হয়েছিল সে সমাজগুলোর বাস্তবতা সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করে। যে ক্ষমতা সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এথনোগ্রাফার ও 'অন্যে'র আপেক্ষিক অবস্থানটি ধ্রুপদী নৃবিজ্ঞানে তৈরি হতো সেটি বদলে গেল। ফলশ্রুতিতে নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সের প্রধান ভিত্গুলো আর কতটা কার্যকর বা অর্থপূর্ণ থাকবে সেটি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন অনিবার্য হয়ে ওঠে। শুধু ঔপনিবেশিকতার অবসানই নয়, ক্রমান্বয়ে সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতিতে এমন সব পরিবর্তন আসতে থাকে যা সামাজিক বিজ্ঞানের 'আধুনিক' ইউরোপীয় নির্মাণের অপর্যাপ্ততা স্পষ্ট করতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলোতে এসে দার্শনিক জিজ্ঞাসাসমূহের প্রভাবে নৃবিজ্ঞানের সংকট তীব্রতর আকার লাভ করে বটে, কিন্তও 'বৈজ্ঞানিক' শাস্ত্র হিসেবে এর অনুমিতিগুলোর

সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হওয়ার সূচনা হয় বৈশ্বিক পরিসরে সমাজ-রাজনীতির ঐতিহাসিক পালাবদলের কারণে। বাংলাদেশের সমাজ বা রাষ্ট্র এই পালাবদলের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইউরোপীয় প্রভাবে নির্মিত হওয়া এবং পরবর্তীতে নানা ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়া – এ বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের বিদ্যায়তন বা বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের ক্ষেত্রে প্রবলভাবে সত্য। অপশ্চিম (প্রাচ্য) সম্পর্কে পশ্চিমের ডিসকোর্স নির্মাণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু হওয়া বা 'অন্য' হিসেবে নির্মিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে আমাদের অঞ্চলকেও যেতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে উঠে আসা প্রশ্নগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেই আমাদের পক্ষে নিজস্ব ধরনের নৃবিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব হবে এরূপ মনে করার কোন যথার্থতা পাওয়া যায় না। কিন্তও আমাদের এখানকার নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার বিকাশকে পর্যালোচনা করলে এ সব বিষয় সম্পর্কে যে আমরা সচেতন রয়েছি তারই শক্তপোক্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইন্টারপ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ ও সাহিত্য হিসেবে এথনোগ্রাফি

বিজ্ঞান ও কলা কিংবা বিজ্ঞান ও মানবিকীর যে বিভাজন সেটাকে অস্পষ্ট করে দেয়ার কাজ, অথবা অন্যভাবে বললে নৃবিজ্ঞান যে কলা কিংবা মানবিক শাস্ত্র হতে পারে সেটা বিশ শতকের শেষের দশকগুলোতে অনেকেই দেখিয়েছেন। জেমস ক্লিফোর্ড যেমন লিখছেন যে 'সাহিত্যিক' দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সাম্প্রতিক সময়ে (তিনি লিখছিলেন ১৯৮৬ সালে) মানবিক বিজ্ঞানগুলোতে বেশ খানিকটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নৃবিজ্ঞানে প্রভাবশালী যেসকল লেখকরা সাহিত্যিক তত্ত্ব ও চর্চার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন, ক্লিফোর্ডের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ক্লিফোর্ড গিয়ার্জ, মেরি ডগলাস, ক্লদ লেভি-স্ট্রস, এডমান্ড লিচ প্রমুখ। এরা প্রত্যেকে যার যার নিজের মতো করে বিজ্ঞান ও কলার মধ্যকার সীমারেখা ঘুচানোর কাজ করেছেন (Clifford, J. 1986: 3)।

সুনির্দিষ্টভাবে বললে, রেডক্লিফ-ব্রাউন পরবর্তী ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানে ইভান্স-প্রিচার্ড কর্তৃক নৃবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে দেখতে চাওয়াটা প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে নৃবিজ্ঞান মানবিকী শাস্ত্র হিসেবে স্থান পায়, এবং অন্যদিকে আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের গিয়ার্জ তার নিজস্ব স্টাইলে ইন্টারপ্রেটিজম অগ্রসর করেন (Barnard 2000, Layton 1997, Kuper, 1999)।

আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি দৃষ্টবাদী বৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে একটি সংহত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে 'রাইটিং কালচার'-এ। এই গ্রন্থের অনুভাষণ অংশে জর্জ মার্কুস লিখেছেন, যে সেমিনারের সুবাদে সংকলনের রচনাসমূহ লেখা হয়েছে সে সেমিনারের লক্ষ্য ছিল কীভাবে এথনোগ্রাফি লেখালেখি সম্পন্ন হতে পারে বা কীভাবে তা পঠিত হতে পারে তার বিবিধ উপায় দেখানোর মাধ্যম্যে এথনোগ্রাফিক চর্চায় সাহিত্য চেতনা সঞ্চারিত করা (...introducing literary consciousness to ethnographic practice by showing various ways in which ethnographies cab be read and written)। তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন এথনোগ্রাফির পাঠ বা বিশ্লেষণকে 'লিটারেরি থেরাপি'র সংশ্লেষে আরও সৃজনশীল, সাহসী এবং উন্মুক্ত করাটাও ছিল তাদের লক্ষ্য।

সাংস্কৃতিক অনুবাদ

এথনোগ্রাফিকে ঘিরে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহকে বোঝার ক্ষেত্রে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো সাংস্কৃতিক অনুবাদের ধারণা। এটিও একভাবে ইন্টারপ্রেটিভিজম ও হারমেনিউটিক এর বিকাশের সাথে যুক্ত। যখন দৃষ্টবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত নৃবিজ্ঞানী বা এথনোগ্রাফার মনে করছেন তার কাজ হচ্ছে সত্যকে পরিবেশন করা তখন সংস্কৃতির অর্থ বা meaning মূল বিষয় থাকে না। অন্যদিকে ব্যাখ্যানমূলক ধারা যখন অর্থকে পাঠ করতে চায় তখন অন্যতম কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক অনুবাদ। সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে তালাল আসাদের কাজের মধ্য দিয়ে (Asad, 1986) সাংস্কৃতিক অনুবাদের বিষয়টি অনেক বেশি আলোচনায় এসেছে এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানে, বিশেষ করে ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানে, এটি রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ইভান্স-প্রিচার্ডের সময়কাল থেকে (Hastrup 1995:22; Layton 1997)।

সাংস্কৃতিক অনুবাদের ধারণাটির পেছনে আসলে যে মূল চিন্তাটি কাজ করে সেটি বস্তুত নৃবৈজ্ঞানিক পরিবেশনের সমগ্র প্রকল্পটিকেই ধারন করে: কোনো একটি সমাজ, সমাজ জীবন, সংস্কৃতিকে অন্য সমাজের ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে কীভাবে উপস্থাপন করা যায় বা পরিবেশন করা যায়? (Fabian 1992) স্পষ্ট করে বললে এটি প্রকৃতপক্ষে নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্তই প্রশ্ন। 'অন্য'কে পরিবেশন আসলে

অন্যতাকে নির্মাণই, অন্যের পরিবেশন প্রক্রিয়া একই সাথে অন্যের নির্মাণ প্রক্রিয়াও। অন্যকে পরিবেশন, অন্যকে নিয়ে লেখা, অন্যকে টেক্সট এর মাধ্যমে উপস্থাপন – এই সামগ্রিক 'অন্যকরণ' প্রক্রিয়াই নৃবিজ্ঞানের এই গোটা জ্ঞানতত্ত্বীয় সংকটের গোড়ায়। এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে, অথবা সংকটকে লঘুকরণের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই সম্ভবত একভাবে জন্ম নিয়েছে রিফ্লেক্সিভিটির ধারণা।

আত্মবাচকতা, আত্ম-অন্বেষণ অথবা আত্ম-প্রতিফলনঃ রিফ্লেক্সিভিটি ও রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফি

সামগ্রিক সমালোচনাধর্মী উপলব্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ হলো এথনোগ্রাফিতে রিফ্লেক্সিভিটির ধারণা আনায়ন। আমেরিকান সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের প্রতীকী ঘরানার তাত্ত্বিকদের মাঝে এই আত্মবাচকতা বা আত্ম-প্রতিফলনের প্রবণতা প্রথম অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। সরল কথায় এটি হলো গবেষক বা এথনোগ্রাফারের সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি। এথনোগ্রাফি এক ধরনের লেখালেখি। এ লেখালেখির ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীরা তাদের কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে কিছু জ্ঞানতত্ত্বীয় ও রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। এ শক্তিসমূহ যে প্রযুক্ত হচ্ছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট সচেতনতা এবং স্বীকৃতি প্রয়োজন। এই ভাবন ও চেতনা এক পর্যায়ে এসে নির্দিষ্ট ধরনের সুস্পষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এথনোগ্রাফিক ঘরানার জন্ম দিলো। একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আত্মবাচকতাপূর্ণ এথনোগ্রাফির বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করা হয় এতে যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে বা যে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হচ্ছে সে বিষয় বা জনগোষ্ঠীর সাথে লেখকের আত্মজৈবনিক যোগাযোগ কতটুকু কী আছে বা নেই তার বিবরণ উপস্থাপন করা হবে; গবেষক এবং গবেষণার অভীষ্ট-জনগোষ্ঠীর মাঝে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সেটি বিবৃত হবে, সে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা বা অসমতার মতো বিষয়গুলো কীভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে সে বিষয়েও খোলামেলা বিবরণ উপস্থাপন করা হবে। যে প্রত্যয় বা ধারণাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে বা হচ্ছে, যেসকল কৌশল এতদিন পর্যন্ত বিনা প্রশ্নে বা বিনা বিশ্লেষণে 'স্বাভাবিক' বলে ধরে নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছিল সেগুলোকে পুণঃবিশ্লেষণ করা হবে। মনে করা হলো এসবের ফলে এথনোগ্রাফার যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে চান সেটি যেমন স্পষ্ট হয়, একই

সাথে স্পষ্ট হয় কোন প্রেক্ষাপটে এবং কোন আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের ওপর দাঁড়িয়ে এথনোগ্রাফার তার এ আলোচনা প্রস্তুত করেছেন, কোন বাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এথনোগ্রাফিক বিবরণটি উৎপাদিত হয়েছে।

অবশ্য এ হলো নমনীয় ধরনের আত্মবাচকতার উদাহরণ। আরও কট্টর এবং আমূলবাদী আত্মঅনুসন্ধান এবং আত্ম-প্রতিফলনের দেখাও পাওয়া যায়। এ ধরনের শক্তিশালী আত্মবাচক ধারণার একটা দিক হলো এই যে: এথনোগ্রাফিক জ্ঞান উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় 'অন্য'কে নির্মাণ বা অন্য সম্পর্কিত জ্ঞান উৎপাদন এমন এক ধরনের জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা যেখানে বস্তুতপক্ষে পশ্চিমা 'আত্ম-সত্তা' ক্রমাগত নির্মিত হয়ে যায়। এক প্রকারের রাজনৈতিক দাবীও এর সাথে যুক্ত হতে দেখা যায় যে, পর্যবেক্ষণের নাম দিয়ে অন্যের যে প্রকাশ বা উপস্থাপনা এথনোগ্রাফির মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে সেটি আসলে লেখালেখির একটি প্রক্রিয়া যেখানে 'অন্য'কে পরিণত করা হয় টেক্সুয়াল ঔপনিবেশিকতার বিষয়ে। এভাবে, কট্টর রিফ্লেক্সিভিটি শেষ পর্যন্ত এরূপ সিদ্ধান্তেও পৌঁছায় যে, যেহেতু নৃবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত 'সমাজ', 'সংস্কৃতি' প্রভৃতি প্রত্যয়সমূহ বেড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, সে কারণে ঔপনিবেশিকতার অবসানের সাথে সাথে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডেরই অবসান হওয়া প্রয়োজন অথবা, অন্তত এসকল প্রত্যয় ব্যবহারের অবসান হওয়া প্রয়োজন।

কমবেশি এ ধরনের একটি উপলব্ধি থেকে লীলা আবু-লুঘদ (Abu-Lughod 1991) 'সংস্কৃতি' প্রত্যয়টিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সংস্কৃতিকে আত্মপরিচয় বা পার্থক্যের নির্ণায়ক হিসেবে যেভাবে নির্মাণ করা হয়েছে সেটির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, "নৃবিজ্ঞানীদের সম্ভবত বিবেচনা করা উচিত যে কী কী কৌশলে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লেখা যায়" ("...perhaps anthropologists should consider strategies for writing against culture.")। তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী সাংস্কৃতিক পার্থক্য বোঝানোর জন্য একই মানদণ্ড বা একই পদ ক্রমাগত ব্যবহার করে যাওয়া হলে ঐ বিশেষ পার্থক্যের ভিত্তিতে এক ধরনের অসম ও ক্রমোচ্চ ক্ষমতা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এর ফলে "পার্থক্যের যে অন্য সব ধরনগুলো রয়েছে সেগুলোকে অবদমন বা অবহেলা করার মতো সহিংসতা চাপিয়ে দেয়া হয় (... always entails the violence of repressing or

ignoring other forms of differnce) (ibid.)।" তিনি দেখান যে, সংস্কৃতি প্রত্যয়টি এমন ধারণার জন্ম দেয় যে, কোনো একটি সংস্কৃতির মধ্যকার সকল মানুষ সমরূপ, সুসংহত এবং সময়হীন। এর ফলে এক ধরনের অনিবার্য সাধারণীকরণ তৈরি হয়, জনগোষ্ঠীর একটি সাধারণ অখণ্ড চিত্র পরিবেশিত বা উপস্থাপিত হয় এবং এরূপ একটি ইমেজ তৈরি হয় যে, 'অন্য' এবং 'আত্ম'/'সত্তা' এর মাঝে যে সীমারেখা দাঁড় করানো হয়েছে তা অনিবার্য, অপরিবর্তনীয় বা স্থির। এ ধরনের সাধারণীকরণ আসলে ক্ষমতার ভাষা হিসেবে কাজ করে এবং ক্ষমতা-সম্পর্ককে বৈধ করে।

জ্ঞানকাণ্ডীয় পরিসরে আত্মবাচকতার চর্চার বিষয়টি এভাবে আবু-লুঘদ খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। নৃবিজ্ঞান যে মূল প্রত্যয়টিকে কেন্দ্র করে তার অধিকাংশ তত্ত্ব ও বিতর্কসমূহ এগিয়ে নিয়েছে সেই প্রত্যয়টির সংকটের দিকে মনোযোগ দেয়ার তাৎপর্য তিনি তুলে ধরেন এবং এভাবে প্রকাশিত হয় জ্ঞানকাণ্ডটির আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্ম সমালোচনার এক গভীর উপলব্ধি। অবশ্য এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রেও তিনি এক ধরনের রিফ্লেক্সিভিটির চর্চা দেখিয়েছেন, যেটি দেখা যাবে বেদুঈন নারীদের সম্পর্কে তার করা এথনোগ্রাফিটির মধ্যে (Abu-Lughod 1986)।

এখন সংক্ষেপে দেখে নেয়া যাক শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞান কখন থেকে এই আত্মবাচকতার প্রয়োজন বোধ করতে থাকে। ১৯৬০ দশকের শেষের দিকে বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আমেরিকান সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে এই আত্ম-অনুসন্ধানী প্রবণতা প্রথম দেখা যায় (Davies 1999; Eriksen and Neilsen 2001; Whitaker 1999)। পরবর্তীতে উত্তরাধুনিক বলে চিহ্নিত বিশ্লেষণগুলোর মাঝ দিয়ে এটি নৃবিজ্ঞানে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে, এবং বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেছেন, উত্তরাধুনিক বিশ্লেষণ নৃবিজ্ঞানে যা কিছু সংযোজন করেছে তার মধ্যে এই আত্ম-বিশ্লেষণী লেখার ধরনটিই হচ্ছে সব থেকে অভিনব (Eriksen and Neilsen 2001)।

১৯৬৯ সালে ডেল হাইমস-এর সম্পাদনায় একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম "Reinventing Anthropology"। ষাটের শেষে নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে যে বিস্তর অস্বস্তি এবং নানা রকম সংশয়ের প্রকটতা তৈরি হচ্ছে তার একটি

সংহত প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই সংকলনটিকে। এ এক আত্মোপলব্ধি এবং আত্ম সমালোচনার কাল। মনে রাখা প্রয়োজন এ কেবল নৃবিজ্ঞানের নব-উপলব্ধি বা নব-চেতনার অভ্যুদয়ের সময় নয়। দুনিয়া জোড়াই এ সময় বদল ঘটেছে, বস্তুত ঘটেছে প্রতিষ্ঠিতকে এবং প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানোর বিস্ফোরক চেষ্টা। একটি আমূলবাদী রাজনৈতিক পরিবেশ সারা ষাটের দশক জুড়ে বিরাজ করে যেটি কীনা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় ষাট দশকের শেষ লগ্ন হতে, প্রকৃতপক্ষে, ১৯৬৮ সাল হতে শুরু করে পরবর্তী দশ বছরে (Eriksen and Neilsen 2001)। ষাটের দশকের প্রতীক হচ্ছে কিউবার মিসাইল সংকট, বার্লিন দেয়াল, মার্টিন লুথার কিং, হিপ্পি আন্দোলন, প্যারিসের ছাত্র দাঙ্গা, বিটলস, চাঁদে মানুষের অবতরণ এবং সর্বোপরি, ভিয়েতনাম যুদ্ধ। অন্যদিকে এর পরের দশক প্রত্যক্ষ করে নিক্সনের নির্বাচন বিজয়, জন লেলনের মৃত্যু, মধ্যপ্রাচ্য সংকট, চিলির সামরিক অভ্যুত্থান, মাইক্রোসফট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা উত্থান প্রভৃতি বৈপ্লবিক স্বপ্নকে। সব মিলিয়ে ষাটের দশকের শেষ এবং সত্তুরের শুরু হচ্ছে দেশে দেশে, সমাজে সমাজে স্বপ্ন, মুক্তি, বিপ্লবের সীমানা বিস্তৃতির সময়কাল। রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিগন্তে নতুন সব চ্যালেঞ্জ, নতুন বিতর্ক, নতুন প্রশ্ন এসময় সামনে আসে এবং এসবের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডে দেখা যায়।

ডেল হাইমসের সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থটি এক কথায় নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে এ সামগ্রিক পরিবর্তনের ধারায় যে নতুন প্রশ্ন, নতুন ভাবনা ও বিশ্লেষণী অনুসন্ধানের সূচনা হয় তার স্মারক বা মেনিফেস্টো। তখনো পর্যন্ত যে ঔপনিবেশিক অতীত বা ঔপনিবেশিক যোগাযোগের মুখোমুখি আমেরিকান নৃবিজ্ঞানীরা হননি, সেই অনিরীক্ষিত অতীত ও অতীতের সম্পর্কসমূহ এবং বিশেষ করে তখনও পর্যন্ত যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষমতা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানীদের পেশাগত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল সেই রাজনীতি ও ক্ষমতার ক্রিয়াশীলতার দিকে নৃবিজ্ঞানীরা গভীরভাবে দৃষ্টি ফেরালেন (Hymes 1969 cf. Davies 1999, Whitaker 1999)। অবশ্য সুস্পষ্ট করে বললে যে তাগিদটা এই আত্মসমালোচনা সূচনা করলো তা অংশত উৎসারিত হয়েছে এই বাস্তবতা থেকে যে, নৃবিজ্ঞানীদেরকে এবং এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মকে সাধারণভাবে তখন ব্যবহার করা হচ্ছিল দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় (মনে রাখতে হয়, বিশেষ

করে ভিয়েতনাম প্রসঙ্গ) গুপ্তচরবৃত্তিসহ অন্যান্য রাজনৈতি উদ্দেশ্য পূরণ লক্ষ্যে (Horowitz 1967; Salemink 1991 cf. Davies 1999) ।

হাইমস সম্পাদিত সংকলনেই G.D. Berremen এর একটি লেখা অন্তর্ভূক্ত ছিল যার শিরোনাম হলো '"Bringing it all back home": malaise in anthropology' । এ লেখায় তিনি মানবতা সংক্রান্ত অধ্যয়নের বিজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও নৃবিজ্ঞানে মানবিক উদ্দেশ্য হাজির না থাকা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মূল্যবোধ নিরপেক্ষ দৃষ্টবাদী জ্ঞানের ধারনা থেকে নৃবিজ্ঞানীদের সরে আসা উচিত বলে তিনি মত দেন। তার বিবেচনায় নৃবিজ্ঞানীদের বরং এমন একটি অবস্থান গ্রহণের ঘোষণা দেয়া উচিত যেখান থেকে তাদের সংগৃহীত জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা নৈতিকভাবে কর্তব্য করণীয় স্থির করে তা সম্পাদন করতে পারে, এবং এর ফলে যেসকল মানুষদের মাঝে তারা কাজ করে সেই মানুষদের সত্যিকারের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সে মতে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান তারা অনুসন্ধান করতে পারে।

এ সংকলনের অন্য একটি প্রবন্ধ ছিল Bob Scholte এর, যেটির শিরোনাম ছিল 'Toward a Reflexive and Critical Anthropology'। আজকে নৃবিজ্ঞানে রিফ্লেক্সিভিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটি এ লেখার মধ্য দয়েই সম্ভবত সূচীত হয়েছিল। নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষ জ্ঞান উৎপাদনের কথা বলা হলেও এথনোগ্রাফিক কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়ায় এই জ্ঞানতত্ত্বের সাথে এথনোগ্রাফারারের রাজনৈতিক অবস্থান, পরিচয় বা যোগাযোগের সংযুক্তি ঘটে যায়। নৃবিজ্ঞানীকে সব সময়ই আত্মসমালোচনায় সচেষ্ট থেকে এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে হবে – এই ছিল Scholte এর প্রবন্ধের মূল সুর (Whitakar 2000)।

এভাবে সামনে আসতে শুরু করে যে, নৃবিজ্ঞানের উৎপাদিত জ্ঞানে ঔপনিবেশিকতার বড় ভূমিকা ছিল এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা 'অন্যে'র প্রতিচ্ছবি এক ধরনে বিকৃত উপস্থাপনা – সত্যের, বাস্ত বের অবিকল বৈজ্ঞানিক পরিবেশন সেটি নয়। বস্তুত তার রাজনৈতিক অবস্থান ও যোগাযোগের কারণে এথনোগ্রাফারের পক্ষে উপনিবেশিত জনগনের ওপর ঔপনিবেশিকতার কী প্রভাব পড়েছিল সেটা অধ্যয়ন করাই অসম্ভব ছিল। আর এখন এথনোগ্রাফারের উচিত ঔপনিবেশিকতার বিভিন্ন রূপকে অধ্যয়ন করা, দেখা

উচিত যে স্থানীয় জনগনের সাথে ঔপনিবেশিক শাসক-শাসনের সম্পর্ক কী হয়েছিল; এবং অধ্যয়নের বিষয়বস্তু আসলে হওয়া উচিত স্বয়ং উপনিবেশ স্থাপনকারীগণই। এথনোগ্রাফিক গবেষণাগুলো কেবলমাত্র নেটিভ জনগোষ্ঠীকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে আংশিক চিত্র উপস্থাপন করেছে, যেটি কীনা একই সাথে মিথ্যা এবং অনৈতিক চিত্র। তাহলে এথনোগ্রাফির আত্মবাচকতা বা প্রতিবর্তিতা এরকম হওয়া উচিত যে, অন্যের অধ্যয়ন একই সাথে নিজের সম্পর্কেও অধ্যয়ন হবে। এথনোগ্রাফিক প্রক্রিয়ায় আত্মতা ও অন্যতার পারস্পরিকতা ও মিথষ্ক্রিয়াকে এখানে বিশ্লেষণের আওতায় আনা হবে (Davies 1999)।

১৯৭৩ সালে প্রকাশিত তালাল আসাদের "Anthropology and the Colonial Encounter" এ ধারায় খুব শীগগীরই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে আবির্ভূত হলো। ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান ও ঔপনিবেশিকতার সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরেন আসাদ। জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্কের নিবিড়তা এবং উৎপাদিত জ্ঞানকে বোঝার ক্ষেত্রে উৎপাদকের রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্ব ক্রমশ সামনে আসতে থাকে। 'অন্য' সম্পর্কিত জ্ঞান এক ধরনের পরিবেশন এবং এ পরিবেশনের প্রধান সংকট হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা-সংশ্লিষ্ট অনুমিতিসমূহ–এই উপলব্ধিটি আরও জোরালো হলো শীগগীরই অন্য একটি সাড়া জাগানো বিশ্লেষণ দৃশ্যপটে হাজির হবার মধ্য দিয়ে। বোঝাই যায় সাহিত্যের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাইদের 'ওরিয়েন্টালিজম' হলো সেই প্রকাশনা (Said 1978)। বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখান যে এসব অঞ্চল সম্পর্কে পশ্চিমা একাডেমিয়ায় যে জ্ঞান উৎপাদন ও চর্চা করা হয় সেটি সম্ভব হয় পশ্চিমা অধিপত্যের কাঠামোর কারণেই। নৃবৈজ্ঞানিক মনোগ্রাফসহ পশ্চিমে এশিয়া-আফ্রিকার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অপশ্চিমা সমাজ সম্পর্কে যে ইমেজ তৈরি করা হয়েছে সেটি কিছু অতি সাধারণ ও ভ্রান্ত দ্বিবিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই বিভাজনে অপশ্চিমকে আবশ্যিকভাবে পশ্চিমের বিপরীত বৈশিষ্ট্যধারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। পশ্চিম যেখানে বিজ্ঞান ও যুক্তিশীলতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, অপশ্চিমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এসবের অনুপস্থিতি।

এভাবে নৃবিজ্ঞান তার নিজের জ্ঞান উৎপান প্রক্রিয়াকে আরও স্পষ্টরূপে উন্মোচন করতে চায়। নিজের সক্ষমতা-অক্ষমতা, সামর্থ্য-সীমাবদ্ধতা নিয়ে সুস্পষ্টরূপে কথা বলার অবস্থান গ্রহণ করে। এ ধারায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য এথনোগ্রাফিও রচিত হয়। আবার রিফ্লেক্সিভিটি সীমাবদ্ধতা নিয়েও অনেক নৃবিজ্ঞানী কথা বলেছেন। তবে, সাধারণভাবে আত্মবাচকতা একটি উর্বর ধারণা হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞানকাণ্ডীয় আত্ম-অনুসন্ধানের প্রভাব

নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে এই চলমান আলাপচারিতায় বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানের আপেক্ষিক অবস্থান কী সে সম্পর্ক কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করা কিংবা এখানকার নৃবৈজ্ঞানিক কাজসমূহের প্রধান প্রবণতা সবিস্তারে তুলে ধরার মাধ্যমে শাস্ত্রীয় বিতর্কের বিষয়ে সচেতনতা বা ঔদাসীন্যের ধরনকে পাঠ করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বর্তমান লেখার পরিসরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্র কেবল তাত্ত্বিক বা পদ্ধতিবিদ্যার জগতে বহমান স্রোতসমূহকে পর্যালোচনা করা নয়, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কী ধরনের পাঠ বা প্রতিক্রিয়া দাঁড়াচ্ছে তা নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এ সব বিষয়ের মাঝে নিজেদের স্থাপিত দেখার সূচনা করাও আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে একটি আন্ত র্জাতিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া কিছু উল্লেখযোগ্য উপলব্ধির প্রেক্ষিতে এ দিকটি নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবতে আমরা বাধ্য হয়েছি। কেবলমাত্র একটি সেমিনার বা সম্মেলনের বিশ্লেষণকে বিবেচনায় রেখে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানের প্রবণতা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌছানো ঝুঁকিপূর্ণ। সে কারণে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বেরিয়ে এসেছে তার সাথে বাংলাদেশের নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার প্রবণতাসমূহ সম্পর্কে সাধারণ যে পর্যবেক্ষণগুলো আমাদের রয়েছে সেগুলোকেও মিলিয়ে নিতে হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, পদ্ধতিবিদ্যা বা এথনোগ্রাফির জগতে চলমান প্রধান বিতর্কসমূহকে ঘিয়ে নিজেদের পাঠ ও অবস্থান তৈরির প্রবণতা এখানে যতটা লক্ষ্য করা যায়, তার তুলনায় ঔদাসীন্য বা অনাগ্রহের প্রবণতাই বেশি দৃশ্যমান। অবশ্যই এ ধরনের

সাধারণীকৃত মন্তব্য পুরো চিত্রের প্রতিফলন করে না। শাস্ত্র চর্চার ইতিহাস নাতিদীর্ঘ হলেও এখানকার নৃবিজ্ঞান চর্চাকারীগণের মধ্যে অবস্থানগত বিবিধতা ইতোমধ্যে স্পষ্ট। এমনকি এ বিবিধতার প্রকাশ হিসেবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ কম বেশি নিজস্ব ধরনের বিশেষায়ন দাঁড় করাচ্ছে। আগ্রহের এলাকা নির্ধারণ, তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ বা জ্ঞানকাণ্ডের সংজ্ঞার্থ নিরূপনের ক্ষেত্রেও নানামুখি অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। তত্ত্ব ও এথনোগ্রাফি সংক্রান্ত বিতর্কগুলো নিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা মাত্রার সচেতনতা বা ঔদাসীন্য। এরই মধ্যে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করছেন বাংলাদেশের জন্য 'প্রাসঙ্গিক' নৃবিজ্ঞান দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে এ সকল তাত্ত্বিক তর্ক বিতর্ক আদৌ কতটুকু প্রাসঙ্গিক।

জানুয়ারি, ২০০৫ এর সম্মেলনে উপস্থাপিত কিছু কিছু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের জীবন, তাদের সমাজ-সংস্কৃতি। চিরায়ত নৃবিজ্ঞানে 'অন্য' সংস্কৃতির নির্মাণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ক যে প্রজেক্ট, সাধারণভাবে লেখাগুলোকে তার সম্প্রসারণ বলেই মনে হচ্ছিল। অন্যতার নির্মাণ ও এ সংক্রান্ত ডিসকোর্সের পরিবেশন যে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, সেই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগত রূপান্তর সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের অনেককেই আদৌ আগ্রহী বলে মনে হয় না। এমনকি কয়েকটি গবেষণাপত্র স্পষ্টরূপে এটা জানিয়েও দেয় যে, গৎবাঁধা ছকে 'অন্যতা'র নির্মাণকে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ মহিমান্বিত উদ্যোগ বলেই বিবেচনা করেন। পাঠককের এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছানোর সম্ভাবনাই বেশি থাকে যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান মানেই হলো এখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 'জীবনে'র অসমস্যায়িত, ছকে বাঁধা পরিবেশন। এ ধরনের অধ্যয়ন বা পরিবেশনে গবেষক ও গবেষিতের ক্ষমতা-সম্পর্ক, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষকের আত্মবাচকতা প্রভৃতি বিষয় যে বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হিসেবে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেটি এ ধারার অধিকাংশ লেখাই আদৌ বিবেচনায় নিতে আগ্রহী নয়।

সাধারণভাবে, এদেশের নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সে যে প্রশ্নগুলো কেন্দ্রীয় মনোযোগের জায়গা দখল করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ গুণগত গবেষণা এবং পরিমাণগত গবেষণার আপেক্ষিক গুরুত্ব, 'একাডেমিক নৃবিজ্ঞান' ও 'প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞান'-এর

টানাপোড়েন, প্রয়োজনমুখী-প্রাসঙ্গিক নৃবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় করণীয়, উন্নয়ন-স্বাস্থ্য-পরিবেশ প্রভৃতি উপক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানীদের করণীয় প্রভৃতি বিষয়। এ ধরনের প্রশ্নগুলো যে নৃবিজ্ঞানের মূল জ্ঞানতাত্ত্বিক আলাপচারিতার সাথে সংশ্লিষ্ট সেটি অধিকাংশ আলোচনাই বিবেচনায় নিতে আগ্রহী নয়। এমনকি মাঠ-কর্মের সমস্যা নিয়েও যে লেখালেখিগুলো হয়েছে সেখানে দু'একটি লেখা ছাড়া অধিকাংশ লেখাই 'বৈজ্ঞানিক সত্য' আবিষ্কারের উদ্যোগকে প্রশ্নাতীত ধরে নিয়ে কথা বলেছে গবেষক ও গবেষিতের মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতার মাপ-পরিমাপ নিয়ে। এগুলো যে নিছকই ব্যি গবেষক ও তার উত্তরদাতার মধ্যকার 'ব্যক্তিগত' সম্পর্কের বিষয় নয় বরং এগুলোর সাথে গত কয়েক দশকে চলমান তাত্ত্বিক বিতর্কগুলোকেও সংশ্লিষ্ট করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট করা হয় না।

উপসংহার

সমালোচনামনস্ক হওয়া আবশ্যিকভাবেই নৈরাশ্য বা নৈরাজ্যের সমার্থক নয়। অন্যদিকে, বাস্তবতা যদি সত্যি সত্যি নৈরাশ্যময় হয় সেখানে ভিত্তিহীন আশাবাদের বিভ্রান্তিকে বাঁচিয়ে রাখাও অর্থহীন। শাস্ত্র-চর্চাকারী হিসেবে আমাদের জন্য জরুরী হচ্ছে পরিস্থির মুখোমুখি হওয়া, পরিস্থিতিকে যথাসম্ভব অনুপুঙ্খ পাঠ করা এবং তার প্রেক্ষিতে নিজস্ব অবস্থানকে সংজ্ঞায়িত করা। বাংলাদেশের যে বাস্ত বতায় আমরা বসবাস করি সেটি একই সাথে বৈশ্বিক বাস্তবতারও অংশ। বাংলাদেশের জন্য নৃবৈজ্ঞানিক স্বাতন্ত্র্য তৈরি করতে গেলে তাই নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের বৈশ্বিক বিকাশকে সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল সেটা করা যেতে পারে। ইউরোপীয়দের কাছে অ-ইউরোপীয় সমাজ যেভাবে 'অন্য' সমাজ ছিল সেই অর্থে অন্য সমাজ অধ্যয়নের আবশ্যিকতা আজকের বাংলাদেশে নেই, বরং আমরা নিজ সমাজেই গবেষণা করতে পারি – এরূপ পরিস্থিতির কারণে এথনোগ্রাফিক জ্ঞান উৎপাদন বা পরিবেশন বিষয়ক যে সংকটের মুখে বৈশ্বিকভাবে নৃবিজ্ঞান পড়ছে তা আমাদের জন্য লঘু হয়ে যায় না। স্ব-সমাজে গবেষণার ক্ষেত্রেও কম-বেশি একই ধরনের জ্ঞানতত্ত্বীয় এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন তৈরি হয়। আমাদের এখন প্রয়োজন সত্যিই নিজের দিকে ভালো করে ফিরে দেখা। এ

ফিরে দেখা আমাদের শাস্ত্রের জ্ঞান উৎপাদন ও পরিবেশন সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ দাঁড় করানোর মধ্য দিয়েই করতে হবে।

তথ্যসূত্র

Abu-Lughod (1986) *Veiled Sentiments: Honour and Poetry in a Bedouin Society*, Barkley: University of California Press.

Abu-Lughod (1991) Writing Against Culture, in Richard G. Fox (ed.) *Recapturing Anthropology: Working in the Present*, Santa Fe: School of American Research, pp 137-62

Asad, T. (1973) *Anthropology and the Colonial Encounter*, London: Ithaka Press

Asad, T. (1986) "The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology. In J. Clifford and G. E. Marcus (ed) *"Writing Culture, the poetics and Politics of Ethnography"*, Oxford University Press.

Asad, T. (1991) 'Afterword: From the History of Colonial Anthropology to The Anthropology of Western Hegemony' in George Stocking Jr. (ed.) *Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge*, Madison: The University of Wisconsin Press

Barnard, A. (2000) *History and Theory in Anthropology*, Cambridge: Cambridge University Press

Barnard and Spencer (1996) 'Culture' in A. Barnard and J. Spencer (eds) *Encyclopedia of Social and Cultrual Anthropology*, London and New York: Routledge

Bohannan. P. (1973) 'Introduction' in P. Bohannan and M. Glazer (eds) *High Points in Anthropology*, New York: Alfred A. Knopf

Bohannan, P. and Glazer, M. (eds) (1973) *High Points in Anthropology*, New York: Alfred A. Knopf

Bunzl, Matti (2002) 'Forward to Johannes Fabian's Time and the Other/ Syntheses of a Critical Anthropology' in *Time and the Other: How Anthropology Makes its Objects* by Johannes Fabian, New York: Columbia University Press

Carr, E.H. (1961) *What is History?* London: Macmillan

Clifford, J. (1986) 'Introduction: Partial Truths' in Clifford, J and G. E. Marcus (eds) *Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnograph*, Delhi: Oxford University Press

Clifford, J and G. E. Marcus (eds) (1986) *Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnograph*, Delhi: Oxford University Press.

Davies, Charlotte A. (1999) *Reflexive Ethnography: A Guide to Research Self and Others*, London and New York: Routledge

Eriksen, Thomas Hylland and Nielsen, Finn Sivert (2001) *A History of Anthropology*, London: Pluto Press

Evans-Pritchar, E. E. (1991) [1951] *Social Anthropology*, London: Cohen and West

Fabian (1983) *Time and the Other: How Anthropology Makes its Objects*, New York: Columbia University Press

Fabian, J (1992) *Time and the work of Anthropology: Critical Essays 1971-1991*. Australia: Academic Publishers.

Geertz, C. (1973) *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York: Basic Books

Geertz, C. (1983) *Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology*, New York: Basic Books

Geertz, Clifford (1986) 'Making experiences, authoring selves' in V. W. Turner and E.M. Burner (eds) *The Anthropology of Experience*, Urbana: University of Illinois Press

Geertz, Clifford (1995) *After the Fact*, Cambridge Mass: Harvard University Press

Harris, M (1968) *The Rise of Anthropological Theory*, New York: Thomas Y. Crowell Company

Hastrup, K. (1995) *A Passage to Anthropology: Between Experience and theory*, London: Routledge

Hastrup, K. and Hervik, P. (1994) *Social Experience and Anthropological Knowledge*, London and New York: Routledge

Hymes, Dell (ed.) (1969) *Reinventing Anthropology*, New York: Pantheon

Kohn, Tamara (1994) 'Incomers and Fieldworkers: A comparative study of social experience' in Hastrup, K. and Hervik, P. (eds) *Social Experience and Anthropological Knowledge*, London and New York: Routledge

Kucklick, H. (1991) *The Savage Within: The Social History of British Anthropology, 1885-1945*, Cambridge: Cambridge University Press

Kuper, A. (1983) [1973] *Anthropologists and Anthropology: The Modern British Social Anthropology*, London: Routledge

_______ (1988) *The Invention of Primitive Society: Transformation of an Illusion*, London: Routledge

_______ (1999) *Culture: The Anthropologists' Account*, Cambridge, MA: Harvard University Press

Layton R. (1997) *An Introduction to theory in Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press

Malefijt, Annemarie de Wall (1976) *Images of Man: A History of Anthropological Thought*, New York: Alfred A. Knopf

Malinowski 1978[1922] *Argonauts of the Western Pacific*, London and New York: Routledge & Kegan Paul

Marcus, J. (1986) 'Contemporary Problems of Ethnography in the Modern World System' in Clifford, J and G. E. Marcus (eds) *Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnograph*, Delhi: Oxford University Press

Nugent, Stephen (1996) 'Postmodernism' in A. Barnard and J. Spencer (eds) *Encyclopedia of Social and Cultrual Anthropology*, London and New York: Routledge

Moore, Henrietta L. (ed.) (1999) *Anthropological Theory Today*, Polity Press

Rabinow, P. (1986) 'Representations are social facts: Modernity and post Modernity in anthropology' in J Clifford and G. E. Marcus (eds) *Writing Culture: the poetics and Politics of Ethnography*, Delhi: Oxford University press

Sahlins, M (1995) *How 'Natives' think: About Captain Cook, for Example*, Chicago: University of Chicago Press

Said. Edward W. (1978) *Orientalism*, New York: Pantheon

Whitaker, Mark P. (1999) 'Reflexivity' in A. Barnard and J. Spencer (eds) *Encyclopedia of Social and Cultrual Anthropology*, London and New York: Routledge.